(৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৩৭৭; ১৩৮৪), সংবাদপত্রে সেকালের কথা - দুই খণ্ড, কলিকাতা।

(৬) বসু, স্বপন (১৪১২) (সম্পাঃ), উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা : দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থামালা -১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা।

(৭) বসু, স্বপন (২০০৩) (সম্পাঃ), সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা।

(৮) বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (২০০৩) (সম্পাঃ), উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

ইংরাজী ভাষা :

1) Engles, Dagmar (1996), *Beyond Purdah? women in Bengal : 1890-1939*, New Delhi.

2) Forbes, Geraldine (1996), *The Cambridge History of India : women in modern India*, Cambridge University Press, New Delhi.

3) Forbes, Geraldine (2005), *women in colonial India : Essays on Politics. Medicine and Historiography*, New Delhi.

4) Meredith, Borthwrick (1984), The Changing Role of women in Bengal, 1849-1905, Princeton.

5) Murshid, Ghulam (1983), *Reluctant Debutante : Response of Bengali women to Modernization, 1849-1905*, Rajsahi.

পারে ব্রাহ্মণদের সাম্প্রদায়িক সংস্কৃত ভাষায় যা বেদ অধ্যয়নের মূল চাবিকাঠি তা থেকে শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হন এবং পরিবর্তে ইংরাজী ও পার্শীর মতো দুটি বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে বাধ্য হন। কিন্তু পরবর্তীকালে অসম্ভবকে সম্ভব করতে জানা অপরাজেয় মানসিকতায় সমৃদ্ধ ডঃ আম্বেদকর দুরন্ত বুভুক্ষা নিয়ে আকণ্ঠ পান করেছিলেন সংস্কৃত ভাষা। এইরকম আরো অনেক সামাজিক বঞ্চনার স্বাদ তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেখান থেকেই শিক্ষা নিয়ে এক সংগ্রামী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সমাজকে বদলে ফেলার।

ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শের প্রতি আস্থাবান ডঃ আম্বেদকর প্রথম থেকেই ভারতীয় সমাজকে অন্তরের গভীরতা দিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন। আর সেকারণেই তাঁর আন্দোলনে প্রাধান্য পায় সামাজিক ন্যায়ের প্রসঙ্গটি এবং ক্রমেই তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন বহুমুখী সামাজিক আন্দোলনের সাথে। আত্মনির্ভরতা, আত্মউন্নয়ন এবং আত্মবিশ্বাস এই মূল মন্ত্রের উপর নির্ভর করে তিনি ভারতীয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিহিত ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাত-পাতের নামে যে সমস্ত কু-প্রথা, কু-সংস্কার হিন্দু সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছিল সেই সমস্ত অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে আজীবন নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যান। এবং দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেন যে, "ভাগ্যের উপর নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসই মানুষের উন্নতির একমাত্র পথ।"

ডঃ আম্বেদকর ভারতবর্ষের সমাজনীতি তথা সমাজ দর্শন কিম্বা রাজনীতিতে উপস্থিত দ্বন্দ্বের কথা, একটা বৈপরীত্যের কথা অত্যন্ত সুনিপুন ও সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে গেছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের যে সমস্যা তা নিছক রাজনীতিতে ক্ষমতা কিম্বা নির্বাচনী কেন্দ্র সংরক্ষণ করেই সমাধান করা যাবে না বরং এটিকে দেখতে হবে একটি সামগ্রিক সমস্যা হিসাবে এবং এর জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষাগত তথা সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তনের। আর ঠিক সেই কারণেই তিনি রাজনৈতিক সংস্কার ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে সামাজিক সংস্কারের ধারণার ওপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, প্রকৃত সংস্কার কখনোই ফলপ্রসু হতে পারে না যদি না সমাজের সর্বস্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক সাম্যকে সুনিশ্চিত করা যায়। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হয় না বরং অধিকার রক্ষিত হয় প্রধানত 'সামাজিক ও নৈতিক বিবেক দ্বারা এবং এক্ষেত্রে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী কৃষ্ণাঙ্গ কিম্বা জার্মানীতে ইহুদিদের প্রসঙ্গ তুলে এনে দেখিয়েছিলেন এই সমস্ত দেশে নাগরিকদের আইনী অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছে এগুলি ছিল অর্থহীন। আর এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি ভারতবাসীর কাছে এই বার্তাই দিতে চেয়েছিলেন সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই হবে প্রাথমিক কাজ। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন সামাজিক গণতন্ত্র ব্যাতীত রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণাকে অর্থবহ করে তোলা যাবে না। আর এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেখানে তিনি বলেছেন "We must make our Political democracy can not last unless there lies at the base of it social democracy what does social democracy mean? It means a way of life which recognises liberty, equality and fraternity as the principlesof life" ভারতবর্ষ যেহেতু এক বৃহৎ সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে তাই তিনি আরো বলেছিলেন, "on 26.01.1950, we are going to enter a life on contradictions." তাঁর সেই ভবিষ্যৎ বাণী আজকের দিনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। স্ববিরোধীতার রূপটি আজও ভীষণভাবে প্রকট। তিনি নিছক সামাজিক সংস্কারেই সন্তুষ্ট না থেকে সমাজকে দেখেছিলেন একজন 'social activist'-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রজ্ঞা, দীর্ঘ অধ্যাবসায় এবং গভীর মনন দিয়ে।

অস্পৃশ্য দলিত সম্প্রদায়কে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য কিম্বা একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি যে সমাজ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সেখানে তিনি নির্ভর করেছিলেন মূলত ১৯২০

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মূক নায়ক' পত্রিকা কিম্বা ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'বহিষ্কৃত ভারত', 'বঞ্চিত ভারত'-এর ন্যায় পত্রিকাগুলির উপর। আর এই পত্রিকাগুলির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য। 'বহিষ্কৃত ভারত'-এ তিনি ঘোষণা করলেন, 'স্বরাজ যদি তিলকের জন্মসিদ্ধ অধিকার হয় অস্পৃশ্যতা মুছে ফেলা আমার জীবনের উদ্দেশ্য।" এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯২৪ সালের ২০শে জুলাই দলিতদের জন্য স্থাপন করলেন রেজিষ্টার্ড সংগঠন 'বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভা।" আর এই আন্দোলনকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে তিনি উপস্থিত করলেন তিনটি মূল মন্ত্র 'educate, agitate and organise' শিক্ষিত হও, আন্দোলিত হও, সংগঠিত হও অর্থাৎ শূন্য প্রাণে শিক্ষা দেবে অধিকার হীনতার জন্য আন্দোলনের প্রেরণা, আন্দোলিত প্রাণ অধিকার অর্জনে অগ্রসর হবে সংগঠিত রূপে। আর তাঁর উপস্থিত এই মূল মন্ত্রকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলল তাঁর বহুমুখী সামাজিক আন্দোলন।

ডঃ আম্বেদকর তাঁর জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একটা ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে সবার আগে পিছিয়ে পড়া দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ করাতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র শিক্ষার আলোই পারে তাদের ঘুমিয়ে থাকা চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে, হারিয়ে যাওয়া সম্মানকে ফিরে পাওয়ার পথকে প্রশস্ত করতে, কিম্বা ঘন অন্ধকারের বাধা পেড়িয়ে মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে। তাই তিনি বলতেন, "নিজের অধিকার নিজেকেই আদায় করতে হবে।অধিকার লাভ করতে হলে যোগ্য হতে হবে। আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করতে হবে। শিক্ষা লাভ করতে হবে। দয়ার দান ও অন্যের পরিত্যাক্ত দ্রব্যাদি নোংরা ও ঘৃণা অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। মানুষের অধিকার নিয়ে মানুষের মত বাঁচতে হবে।" সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি সবথেকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষার ওপর, কারণ তিনি নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছিলেন উচ্চ বর্ণের লোকেরা পিছিয়ে পড়া দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরকে কীভাবে কুসংস্কার, অশিক্ষা, ধর্মান্ধ করে রাখার জন্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস চালাতেন। তাই তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন একমাত্র শিক্ষাই হবে শূদ্রদের মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই তিনি চাইতেন, "শিক্ষা মানুষের নাগালের মধ্যে থাকা উচিত। অতএব শিক্ষানীতি এমন হওয়া উচিত যাতে যথা সম্ভব কম ব্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ অনগ্রসর শ্রেনীর জনগনের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়। যদি সকল শ্রেনীর মানুষকে সমান স্তরে আনতে হয় তাহলে একমাত্র পন্থা হচ্ছে সাম্যের নীতি গ্রহণ করা এবং সাধারণ স্তরের নীচে যারা রয়েছে তাদের জন্য কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া। শিক্ষাকে পুরোপুরি রাষ্ট্রের হাতে নিতে হবে।" তিনি শুধু বর্তমানই নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরেও যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "আমাদের প্রত্যেককে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের যদি আমাদের চেয়ে উন্নততর স্তরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা না করি তবে আমাদের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কোথায়? সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ করে গড়ে তোলবার পবিত্র দায়িত্ব পালন আমাদের করতেই হবে। মূলতঃ এই উদ্দেশ্যকেই বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ১৯২৮ সালে তিনি 'ডিপ্রেসড ক্লাসেস এডুকেশন সোসাইটি' গঠন করেন। এই সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিপীড়িত নির্যাতিত শ্রেনীর ছেলে মেয়েদের বিনা খরচায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া। ডঃ আম্বেদকরের এই সৎ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় সাড়া দিয়ে পরবর্তীতে তৎকালীন বোম্বাই সরকার, সরকার পরিচালিত পাঁচটি নির্যাতিত শ্রেনীর হোস্টেল পরিচালনার ভারও এই সোসাইটির হাতেই তুলে দেয়। কিন্তু হোস্টেল সমূহ পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ সরকারী সাহায্যের আশা তিনি সরকারের কাছে করেছিলেন তা তিনি পাননি। তখন অপরাজেয় ডঃ আম্বেদকর জনগনের কাছেই সাহায্যের আবেদন জানান। এক্ষেত্রেও তিনি প্রত্যক্ষ করলেন বিভেদটা স্পষ্ট। বর্ণ হিন্দুদের তুলনায় পার্সী ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলিই তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। অস্পৃশ্য ও নির্যাতিত শ্রেনীকে শিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিত করার সকল প্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টাই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই একই উদ্দেশ্য সাধনের

জন্য ১৯৪২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রী হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের ৮ই জুলাই তিনি গঠন করলেন 'পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি' বৌদ্ধধর্মের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বোম্বাই শহরে ১৯৪৬ সালের ২০শে জুন প্রতিষ্ঠা করলেন 'সিদ্ধার্থ কলেজ'। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'পিপ্লস এডুকেশন সোসাইটি'র মাধ্যমে ঔরঙ্গাবাদে প্রতিষ্ঠা করলেন 'মিলিন্দ কলেজ' ও পরবর্তীতে মহারাষ্ট্রেও তাঁরই নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরো অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। আর এই মন্ত্রেই দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন সমগ্র অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ দলিত সম্প্রদায়কেও তাদের আত্মমুক্তির লক্ষ্যে।

ডঃ আম্বেদকর জানতেন অপহৃত অধিকার কখনো উপহার স্বরূপ আসবেনা। তার জন্য প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শূদ্র, বৈশ্য, অচ্ছ্যুৎদের সম্মিলিত সংগ্রাম। আর তিনি এও বিশ্বাস করতেন সংগ্রাম একা সেনাপতি জিতাতে পারেনা। অধিকারবোধহীন মানুষগুলির মধ্যে যতক্ষন না অধিকার বোধ জাগ্রত করা যাবে, অসহায় আত্মসমর্পণ থেকে তাদের বিরত করা যাবে ততক্ষণ সংগ্রামের জন্য তাদের সংগঠিত করা যাবেনা। এই ছিল আম্বেদকরের সমাজ সংস্কারের দ্বিতীয় মন্ত্র। এই কারণ হেতুই তিনি বলেছিলেন— "ভীষণভাবে প্রয়োজন আছে এই দলিত মানুষের মধ্যে যে বীভৎস সন্তোষ বোধ বিদ্যমান তা নির্মূল করতে আর তাদেরই অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে ঐশ্বরিক অসন্তোষ বা অনন্ত উচ্চাশা। সেটাইতো সব উন্নতির গোড়ার কথা। সতীর্থদের করুণ দূর্দশা, অসহয়তা, লাঞ্ছনা, অপমান একদিকে যেমন তাঁকে বিচলিত করে তুলত আবার অস্পৃশ্য দলিত সম্প্রদায়ের সীমাহীন দারিদ্রতা, আশা-আকাঙ্খাহীন শূন্য জীবন তাঁকে করে তুলতো আবেগ তাড়িত। কিন্তু তবুও অপরাজেয় ডঃ আম্বেদকর এই নিরুৎসাহী, অধিকার বোধহীন মানুষগুলিকেই সংগঠিত হতে শিখিয়ে ছিলেন তাঁর নিরলস সাধনার মধ্য দিয়ে। কখনো পিতৃত্বের উষ্ণতায় কাছে টেনে নিয়ে তো আবার কখনো অভিভাবকত্বের দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন— "তোমাদের করুণ মুখের বোবা দৃষ্টি আর বিষন্ন কণ্ঠস্বর শুনে আমার বুক ভেঙ্গে যায়। তোমরা যুগ-যুগান্ত ধরে কেবলই আর্তনাদ করে চলেছ। তবু তোমরা তোমাদের বেসাহারা জীবনকে কেন এমন নির্লজ্জ ভাবে আলিঙ্গন করে বেঁচে আছ এক অনিবার্য ভবিতব্যের আশায়। তোমরা ভ্রুণাবস্থায় কেন মরে যাওনি? কেন তোমরা পৃথিবীর দুঃখ দারিদ্র আর দাসত্বের কলঙ্কিত চিত্রকে করুণতর, বিষন্নতম করে তুলবার জন্য বেঁচে আছ! তোমাদের জঘন্য, মলিন আর শোচনীয় জীবনের বোঝায় কেন তোমরা পৃথিবীর বোঝা বাড়িয়ে তুলছ? যদি তোমরা নতুনতর উন্নত এক জীবনে উত্তীর্ণ হতে না পার, যদি নব যৌবন লাভ করতে নাই পার, তাহলে বরং তোমাদের মরে যাওয়াই ভাল ছিল, পৃথিবী শান্তি পেত। কিন্তু আসলেতো তোমাদেরও সমান সমান অধিকার ছিল; তোমাদের জন্মগত অধিকার আছে এদেশের মহান ক্ষুদ্র যেকোন মানুষের সমানুপাতে রুটি, কাপড়া, মকানের সুযোগ সুবিধা ভোগের। যদি সব কিছু পেয়ে সসম্মানে বেঁচে থাকতে চাও তোমাদের নিজেদেরই নিজেকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।" সমস্তরকম প্রতিকূলতা অতিক্রম করেই ডঃ আম্বেদকর অপহৃত অধিকার ফিরে পাওয়ার তাগিদ থেকেই দলিত অচ্ছ্যুৎদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুললেন। শুরু করলেন মহারাষ্ট্রের মহাড়দের দিয়েই। ক্রমেই তাঁর সংগঠন সমগ্র ভারতের দলিত, পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষদেরকে নিয়ে এল একই ছাতার তলায়। যদিও সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই স্ববর্ণদের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "কোন সংগঠন যা অস্পৃশ্যদের দ্বারা পরিচালিত নয় কিম্বা কোন ব্যক্তি যিনি অচ্ছ্যুৎ নন নিজে, তাদের কোন অধিকার নেই দলিত জনতার স্বার্থ রক্ষার কথা বলার।" কারণ উচ্চজাতের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন যেগুলির আপাত লক্ষ্য যদিও ছিল দলিত মুক্তি কিন্তু আড়ালে তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। উচ্চ জাতের দ্বারা পরিচালিত এই ধরণের দূরঅভিসন্ধি মূলক সংগঠন গুলিকে তিনি তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছিলেন। শুধু এখানেই শেষ নয় দলিত মুক্তির লক্ষ্যে গড়ে ওঠা উচ্চ জাতের দ্বারা পরিচালিত সংগঠনের মধ্যে তিনি কংগ্রেসের নোংরা ক্লেদাক্ত রাজনীতিকেও প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। আসলে মুখ ও মুখোশের ফারাকটা তিনি ধরে ফেলেছিলেন। নিরলস সাধনায় অকুতোভয়

ডঃ আম্বেদকর দলিতদের সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে ছুটে চললেন দেশের এপ্রান্ত হতে ওপ্রান্তে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বাগ্মীতা, আত্মত্যাগ, অস্পৃশ্য-দলিতদের প্রতি মমত্ববোধ সংগঠনকে একদিন করে তুলল পরিপুর্ণ। বিভিন্ন সভা, সমিতি, পত্রিকায় লেখালেখির মধ্য দিয়ে পিছিয়ে পড়া এই মানুষ গুলির মধ্যে তিনি সঞ্চার করলেন নতুন প্রাণের আশা, উদ্বুদ্ধ করলেন সংগ্রামী মানসিকতায়। ১৯২৭ সালের জুন মাসের "বহিষ্কৃত ভারত" পত্রিকায় চেতনাহীন মানুষ গুলির মধ্যে চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন। "এখন বিচার্য বিষয় ধর্মের জন্য মানুষ না মানুষের জন্য ধর্ম তৈরী হয়েছে। দলিতেরা সেই ধর্মের জন্যই প্রাণপাত করবে যে ধর্ম তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে কিন্তু যে ধর্ম দলিতদের দিকে তাকাল না সে ধর্মের জন্য দলিতদের মাথা ব্যাথা নেই। চিরতরের জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা হিন্দু না অন্য কিছু।" তাঁর এই ঘোষণার পর দু-দুটি বছর কেটে গেলেও তাদের সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন তিনি দেখলেন না, বরং তিনি দেখলেন অস্পৃশ্য হিন্দুরা অচ্ছ্যুৎ দলিত সমাজের বাইরে অনাকাঙ্খিতই থেকে গেছে। অথচ তিনি এও দেখলেন মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পার্শী কিম্বা সদ্য ধর্মান্তরিতরাও এসমাজে পূর্ণ মর্যাদায় জীবন যাপন করতে পারেন কারণ সমাজে প্রচলিত নিয়মানুসারে ধর্মান্তরের সাথেই নাকি তার জাত বা অস্পৃশ্যতা দুর হয়ে যায়। মানুষ হয়ে মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার পায়। কিন্তু অস্পৃশ্য হিন্দুরা যে তিমিরে ছিল থেকে গেছে সেই তিমিরেই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে জলগাঁও এর এক জনসভায় তিনি আবারও ঘোষণা করলেন, "এটা পরিস্কার যে, হিন্দু হিসাবে বাকি হিন্দুদের থেকে ছোট জাতের মানুষেরা কোন ন্যায় ও মানবিক অধিকার কিছুতেই পেতে পারেনা। সুতরাং নির্দিষ্ট কালের মধ্যে বর্ণ হিন্দুরা যদি তাদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার, দারিদ্রতা আর অবসন্নতার প্রতিকার করতে এগিয়ে না আসে, তবে আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠ মহাড়েরা আত্মসম্মানকামী দলিতেরা এই মানবিক অধিকারহীন হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে যেকোন ধর্মের শীতল ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন।" ডঃ আম্বেদকরের এই ঘোষণায় উৎসাহীত হয়ে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই দেখা গেল কয়েকজন অস্পৃশ্য হিন্দু নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেন মানুষের জাতে ওঠার জন্য। ভারতবর্ষে ধর্মান্তর যদিও এই প্রথম ছিল না তথাপি ডঃ আম্বেদকরের ঘোষণার অব্যহতি পরেই এই ধরণের ধর্মান্তর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল ধর্মান্ধ, স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ্য সমাজের দুর্দিন আগত প্রায়।

ডঃ আম্বেদকর তাঁর সমাজ সংস্কারের তৃতীয় নীতি অনুযায়ী যখন সংগঠিত দলিত সম্প্রদায়কে নিয়ে অবতীর্ণ হলেন দলিত মুক্তির সংগ্রামে তখন অন্যদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে চলছিল দেশী-বিদেশী, শাসকে-শাসকে আপোষ রফার, ক্ষমতা হস্তান্তরের অহিংস আন্দোলন। কিন্তু আত্মসম্মানী সংগ্রামী পুরুষ হিসাবে পরিচিত আম্বেদকর আপোষের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেননা। যেকারণে তিনি কোনদিন উচ্চ জাতের নেতৃত্বে পরিচালিত দলিত সংগ্রামে একদিকে যেমন বিশ্বাস রাখেননি। তেমনি দলিতের আত্মমুক্তি সংগ্রামকেও হিংসা বা অহিংস এই দুই এর কোন একটির মধ্যেও সীমাবদ্ধ রাখেননি। আর সেজন্যই তিনি তাঁর সতীর্থদের বলেছিলেন— "হিংসা কিম্বা অহিংস সংগ্রাম যে পথেই হোক, যদি তার লক্ষ্য মঙ্গলকর হয় তবে তা যথার্থ, যখন তোমাদের কেউ হত্যা করতে আসবে কিম্বা কোন নারীর মর্যাদা লুঠ করতে চেষ্টা করে, চুরি করে এবং এই কর্মের সময় মারা পড়ে, তখন সে তার আত্ম কর্ম ফলেই মারা পড়ে, যেমন প্রতিটি আক্রমনকারী শয়তানের মৃত্যু হয়।" প্রসঙ্গত তিনি গান্ধিজীর আন্দোলনের অহিংস প্রকৃতিকে তাঁর মতো করে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন— "কারো বিশ্বাসে আঘাত করাই যখন হিংস্রতা, গান্ধীর সত্যাগ্রহও হিংসা ভিত্তিক।" তিনি সতীর্থদের সংগ্রামের প্রকৃতি কীরকম হওয়া বাঞ্ছনীয় তা আলোচনা প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন যে, "সত্যি কথা বলতে কি, অহিংস ততক্ষনই গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ সম্ভব কিন্তু যখনই প্রয়োজন আন্দোলন হিংস্র হবেই।" সংগ্রাম শুরুর আগেই যেমন তিনি শত্রুকে চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন ঠিক তেমনি সতীর্থদের এও বুঝিয়ে

দিয়েছিলেন কাদেরকে শত্রু বলে চিহ্নিত করতে হবে। তিনি বলেছিলেন— "যেকোন মানুষ যে ব্রাহ্মণ্যবাদকে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ উঁচু জাত নীচু জাতের তত্ত্বে বিশ্বাস করে অর্থাৎ মানুষের স্পর্শে অপবিত্রতার উদ্ভব হয় এই নীতিতে বিশ্বাস করে বা জাত ভিত্তিক জন্মগত সুযোগ সুবিধার বৈষম্যে বিশ্বাস করে, তাকে তিনি অস্পৃশ্যদের শত্রু বলে মনে করেন। পুরুষালী ভঙ্গিমায় সুনীপুণ রণকৌশলে সংগ্রামী সাথীদের নিয়ে যখন ডঃ আম্বেদকর তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন তখন তাঁর প্রশ্নাতীত নেতৃত্বের মর্যাদাকে খাটো করার জন্য একজন কংগ্রেসী নেতা বলেছিলেন, "তোমার নেতৃত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বীতার পিছনে আছে কেবলমাত্র ভেড়ার পালের অন্ধ আনুগত্য।" জবাবে তিনি বলেছিলেন, "ঠিক! কিন্তু মনে রেখো আমার এই ভেড়ার পালকে আমি তাদের গন্তব্য স্থানে পৌছে দেবোই।"

বিস্ময়কর হলেও সত্য ধারণাতীত যোগ্যতায় অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন তিনি। কতিপয় স্বার্থন্ধ সুবিধাভোগী বিত্তবান মানুষ যেভাবে হিন্দু শাস্ত্র সমূহকে নিজেদের সুবিধা মতো ব্যাখ্যা করেছিলেন সেগুলিকে তিনি তাঁর নিরলস আপোষহীন সংগ্রামের দ্বারা ভুল প্রমাণিত করেছিলেন। শুধু তাই নয় স্বয়ং 'হিন্দু-ঈশ্বর' যাদের মানুষ বানাতে বিরত থেকে ছিলেন তাদের তিনি মানুষ হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশ্বের দরবারে। শাস্ত্রের স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল হয়ে নয় শাস্ত্রকে, ঈশ্বরের বিধানকে, মনুস্মৃতির শ্লোকের উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করলেন সেগুলি ভ্রান্ত সেগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বরং শূদ্রের শক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত শূদ্রের মানুষী পরিচয়। আর ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী নয়, মানুষ হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে, পরিচিত করিয়েছেন মানুষ হিসাবে ভারতের প্রতিটি দলিত মানুষকে।

ডঃ আম্বেদকরের বহুমুখী সামাজিক আন্দোলনগুলির মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে কোলাবার চৌদার জলাশয় অভিযান, মনুস্মৃতির দহন ও কলারাম মন্দিরে সত্যাগ্রহের সফলতা ভারতীয় জনমানসে যথেষ্ট আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল। ১৯২৩ সালে প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক এস. কে. বোলের বোম্বে লেজিস লেটিভ কাউন্সিলে আনীত এক প্রস্তাব অনুসারে জনসাধারণের ব্যবহার্য জল সরবরাহ স্থল, নলকূপ, ধর্মশালা ইত্যাদি যা জনসাধারণের টাকায় গড়ে উঠেছে কিম্বা জনসাধারণের দেয় ট্যাক্স-এ যার রক্ষণাবেক্ষন করা হয় সে সমস্ত কিছুই যা এতকাল অস্পৃশ্য-অচ্ছ্যুৎ, দলিতেরা ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন তা বোলের আনীত প্রস্তাবানুসারে তাদের জন্যও উন্মুক্ত করা হলেও রক্ষণশীল পুরোনো পন্থী হিন্দুদের কারণেই কোলাবার প্রসিদ্ধ চৌদার জলাশয়ের সুস্বাদু জল পান করার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিতই থেকে গেলো। ছত্রিশ বৎসরের আত্মসম্মানী যুবক কিছুতেই মেনে নিতে পেরেছিলেন না এই অমানবিক ঘৃণ্য আচরণ। যে পুকুরে জলপানের অধিকারী কীটপতঙ্গ, কুকুর-শৃগাল থেকে শুরু করে দেশী-বিদেশী প্রত্যেক সম্প্রদায়-জাতের মানুষ। এমনকি সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান যারা কিনা কিছুদিন আগেও ছিল অচ্ছ্যুৎ, অস্পৃশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ তারাও তবে বাধা কোথায় হিন্দুদেরই একটি অংশ যারা কিনা অচ্ছ্যুৎ, অস্পৃশ হিন্দু বলে পরিচিত তাদের জন্য। এই ধরণের বিভিন্ন প্রশ্নবানে বিদ্ধ ডঃ আম্বেদকর এর বিবেক মেনে নিতে পারলেন না অপমান। সংগঠন করলেন অপমানিত, লাঞ্ছিত বৈষম্যের শিকার পিছিয়ে পড়া সেই জনসমষ্টিকে এবং দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন— "আমাদের যারা বিরুদ্ধতা করছেন, যারা আমাদের বঞ্চনার শিকার বানিয়েছেন, তাদের আমি প্রথমেই পরিষ্কার ভাবে শুনিয়ে বলছি যে আমাদের এই চৌদার পুষ্করণী থেকে এতকাল জলপান করতে দেওয়া হয়নি বলে আমরা মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাইনি। আমরা আজ এখানে এই পুকুরের জল গ্রহণের জন্য জমায়েত হয়েছি তার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা প্রমাণ করে দেখাতে চাই আমরাও অপর সকলের মতই মনুষ্য প্রাণী।" এই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতেই ১৯২৭ সালে ১৯শে ও ২০শে মার্চ ডঃ আম্বেদকরের সভাপতিত্বে নির্যাতিত শ্রেনীর একটি প্রকাশ্য সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে চৌদার-পুকুর অভিযান কর্ম ঘোষিত হয়। ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী হাজার হাজার অস্পৃশ্য মানুষের জনজোয়ার চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পূর্ণ শৃঙ্খলিত মর্যাদায় ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে এগিয়ে চলল পুকুরের দিকে। পুকুরের চারপাশে

একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জল স্পর্শ করলেন তার আঁজলা ভরে সেই জল পান করলেন। হাজার হাজার মানুষ ঠিক এইকইভাবে অনুসরণ করলেন তাঁদের বাবা সাহেবকে। এই ছিল তাঁর প্রথম সংগঠিত গণঅভ্যুত্থান। কিন্তু এতেও জেগে উঠলনা ব্রাহ্মণদের ঘুমন্ত বিবেক। ব্রাহ্মণবাদী হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধের চাপে ক্রমেই তা রূপ নিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। শেষ পর্যন্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন মুসলীম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা। তাদেরই দেওয়া এক খন্ড জমির উপর প্যান্ডেল করে ওজস্বী ডঃ আম্বেদকর দৃঢ়তার সাথে উপস্থিত হাজার হাজার অস্পৃশ্য-অচ্ছ্যুৎ মহার, মুচি, মেথর এদের মনে প্রেরণার বীজ বুনে দিয়ে উৎসাহিত করলেন এবং আহ্বান করলেন মানুষ হয়ে বাঁচার সংগ্রামে জেতার জন্য। ডঃ আম্বেদকর এই প্রসঙ্গে শুধু গণসংগ্রামেই সীমাবদ্ধ না থেকে এই দাবীকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে প্রবেশ করেছিলেন আইন আদালতে সমরাঙ্গনেও।

ডঃ আম্বেদকর তাঁর অধ্যাবসায়, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা, বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, যুগ যুগ ধরে জাত-ধর্মের দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যা করেছেন তা আসলে অধর্ম, অন্যায়। দরিদ্র, অসহায়, অস্পৃশ্য, অচ্ছ্যুৎরাও যদি সামান্যতমও সুযোগ-সুবিধা পান তাহলে ব্রাহ্মণরা, উঁচু জাতের লোকেরা যা করতে পারেন তার থেকে অনেক বেশী তারাও করে দেখাতে প্রস্তুত তা তিনি নিজের প্রতিভা দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন। 'we are also human beings' —এই প্রমাণের তাগিদ থেকেই ১৯২৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সবাইকে বিস্মিত করে প্রকাশ্যে 'মনুস্মৃতি' দহনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ 'মনুস্মৃতি' বর্ণ ব্যবস্থাকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলে বিধান দেয়। অর্থাৎ এক কথায় সামাজিক বৈষম্যকে শিকার করে নেয়। ডঃ আম্বেদকর 'মনুস্মৃতি'-র বিধানগুলি পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পশ্চাদপদতা, ধর্মীয় পঙ্গুতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অস্থিরতা সমস্ত কিছুর জন্যই দায়ী করেন বর্ণ হিন্দুদের পরম পবিত্র গ্রন্থ 'মনুস্মৃতি'কেই শুধু তাই নয় এই গ্রন্থের জন্যই অস্পৃশ্য-অচ্ছ্যুৎরা হারিয়েছে তাদের সমস্ত মানবাধিকার। বাধ্য হয়েছে মানুষ হয়েও পশুর অধম জীবন যাপনে। মনুর কয়েক বিধান পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে সেগুলি শূদ্রদের প্রতি কতটা অমানবিক। যেমন মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায় ৪২৭তে বলা হয়েছে 'ব্রাহ্মণ জীবন ধারণে অসুবিধায় পড়লে বিনা দ্বিধায় শূদ্রের জিনিস বাজেয়াপ্ত করতে পারে।— শূদ্রের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তই শুধু নয়, ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করলে তার শ্রমও বিনা পারিশ্রমিকে নিতে পারে। কারণ তার সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণের দাস হওয়ার জন্য।' আবার দশম ৯৬.এ বলা হয়েছে 'নিম্নতম বর্ণের কোনো মানুষ যদি লোভবশত উচ্চ বর্ণের মতো জীবন যাপন করে তবে রাজা বা শাসক যেন তার ধন-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাকে নির্বাসনে দেন। শূদ্রদের উদ্দেশ্যে এইরকম অজস্র বিধান দেওয়া হয়েছে বর্ণ হিন্দুদের অত্যন্ত পবিত্র ও মাননীয় গ্রন্থ 'মনুস্মৃতিতে'তে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘড়িতে তখন রাত্রি ন'টা প্যান্ডেলের সামনে পূর্বেই প্রস্তুত রাখা এক বড় গর্তের মধ্যে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হল দলিতের মৃত্যুদন্ডের দলিল, শতশত বৎসরের মহাসর্বনাশের অনুশাসন 'মনুস্মৃতি' সঙ্গে সঙ্গে ঘোষনা করলেন 'কালাকানুন মনুস্মৃতি জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও।' এইভাবেই কার্যত হাজার হাজার বছরের সামাজিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছিলেন।

ধর্মে উপর বর্ণ হিন্দুদের একাধিপত্যেডঃ আম্বেদকরের কলারাম মন্দিরে সত্যাগ্রহ ছিল এক জোড় আঘাত। ১৯৩০ এর ২রা মার্চ নাসিকে কলারাম মন্দিরে দলিতদের প্রবেশাধিকারে উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং গুজরাট থেকে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের জমায়েত নিঃসন্দেহে ছিল যথেষ্ট গুরুত্ববহ বিষয়। মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল জনস্রোত যদিও মন্দিরের দ্বার রুদ্ধই থাকল, মন্দিরে প্রবেশে বাধা পেয়ে তাদের গন্তব্য ছিল গোদাবরী নদীর তটরেখা। এখানে সভায় বক্তব্য রাখলেন বাবা সাহেব। সেখান থেকেই গৃহীত হল দ্বিতীয় দিন মন্দিরে প্রবেশের কর্মসূচী। আর এখানেই বিবাদের সূত্রপাত বর্ণহিন্দুদের সাথে অস্পৃশ্য দলিত সম্প্রদায়ের। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আম্বেদকর আহত হলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ লড়াই-এ অতঃপর খুলে গেল মন্দিরের দরজা। মিলল সবার প্রবেশাধিকার, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাবা সাহেবের এই লড়াইও পেল সফলতা।

সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাবা সাহেব শুধুমাত্র যে অস্পৃশ্য-অচ্ছ্যুৎ দলিত এর জন্যই ভেবেছেন তা কিন্তু নয়। তিনি দেখেছিলেন সমাজে একইভাবে পিছিয়ে রয়েছে নারীরাও। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এই সমাজ ব্যবস্থাতে দলিত, শ্রমিক ও স্ত্রী জাতি সার্বাধিক দমিতা। তিনি বলেছিলেন, ''ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সব থেকে বেশী নির্যাতনের শিকার হয়েছে নারী সমাজ। তারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত্য অধিকার বিহীন থেকে পুরুষের কৃপার পাত্র অথবা ভোগের সামগ্রী হয়ে বেঁচে রয়েছে। নারী সমাজের প্রতি এতবড় অসম্মান আর কোন ধর্ম করেনি। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে হিন্দু সমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্যে হিন্দু কোড বিল তৈরীর ভার প্রধান মন্ত্রী নেহেরু তাঁকে অর্পণ করেন। সমাজ সংস্কারক উৎসাহী আম্বেদকর বিলে যৌথ পরিবারের ক্ষতিকার দিক হিসাবে মেয়েদের অধিকার, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে ডঃ আম্বেদকরের প্রস্তাব সমূহ হিন্দু মসাজের প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলদের প্রবল বাধার মুখে পড়ে। হিন্দু কোড বিল নিয়ে বিতর্কে সামনে চলে আসে হিন্দু সমাজে নারীর অধিকারের প্রশ্নটি। এব্যাপারে আম্বেদকর যা বলেছিলেন তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন, ''হিন্দু সমাজ শূদ্রদের যে চোখে দেখে, নারীদেরও সেই একইভাবে দেখে— উভয়ের ক্ষেত্রেই সমাজ তাদের কোন অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। হিন্দু বিবাহের নিয়ম হচ্ছে— "Polygamy for man and perpetual slavery for the women" তিনি সমাজের কাছে আরো প্রশ্ন রেখেছিলেন এইভাবে ''হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য। নারীর বর্ণাশ্রম নেই, কেন? তারা কি মানব সমাজের বাইরে? তারা কি গুণহীন? হিন্দু শাস্ত্রকারদের মতে নারী মাত্রই শূদ্রাণী এবং তার কোন স্বাধীন সত্ত্বা নেই। নারী সমাজের প্রতি এতবড় অসম্মান আরকোন ধর্ম করেনি। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজে নারীর অগ্রগতি ভিন্ন সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। তাই তিনি ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও লেখাপড়ার ওপর জোড় দিয়েছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সংগ্রামী পুরুষ ডঃ আম্বেদকর তিনি শুধু সমাজ সংস্কারকই ছিলেন না তিনি দলিত সমাজের পরিত্রাতাও ছিলেন। জীবনের শুরুতে তিনি যে সমাজ সংস্কারের উপর জোড় দিয়েছিলেন সেই তিনিই জীবনের একটা সময়ে এসে যখন উপলব্ধি করলেন যে ধরণের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি দেখতেন তা ঠিক সেইভাবে সফলতা পেলনা। তাই তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন "I feel sad because I have not been able to fulfil my mission to the extent I wanted" এর জন্য তিনি যেমন একদিকে বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন অন্যদিকে তেমনি তার নিজের সমাজকেও দায়ী করেছেন এবং বিশেষ করে দায়ী করেছেন দলিত সম্প্রদায়ের সেই অংশটিকে যারা কিনা উচ্চশিক্ষা ও সম্মানজনক পেশা লাভ করা সত্ত্বেও তাদের সমাজেরই শোষিত দুর্ভাগ্য পীড়িত মানুষগুলির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল না। ডঃ আম্বেদকর তাদেরকেই দলিত সমাজের সবচেয়ে বড় শোষক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বেদনার্ত ডঃ আম্বেদকর আরো বলেছিলেন, "The educated higher educated class (form Dalit Samaj) have betrayed me. I had expected that after acquiring education- highly education - they will serve the society. But I see a crowd of clerks who are engaged in feeding their own stomach." সমাজকে সম্পূর্ম বৈষম্য মুক্ত ন্যায়ের নীতি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সমাজ সংস্কারের আগে রাজনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন এই ভাবনাও একটা সময় তাঁর মনে স্থান করে নেয়। পুণায় একটি অনুষ্ঠানে একটি বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ''আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভোজ কিম্বা মন্দির, কূপ চাহিনা— আমি চাহি সরকারী চাকুরী, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। সমাজে জাতিভেদ ছাড়া গুণভেদ ইত্যাদি অন্যান্য বৈষম্যও রহিয়াছে। এইসবের উচ্ছেদ সাধন কল্পে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন। এই কারণে আমার মত এখন পরিবর্তিত হইয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, সমাজ সংস্কারের পূর্বে শাসন সংস্কার হওয়া উচিত''।

একই সঙ্গে একাধিক গুণের অধিকারী আম্বেদকর একদিকে ছিলেন সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কর্ণধার, একজন ধর্মসংস্কারক, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী, হিন্দু ধর্ম বিরোধী একজন সাহসী পুরুষ। অন্যদিকে তেমনি তিনি হলেন সংবিধানের মুখ্য স্থপতি কিম্বা বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা বা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ। তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ গুণগুলি তিনি একদিকে যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন অন্যদিকে বহুল সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছিলেন, তাই তাঁর চরিত্রের কোন একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনের রূপকে সম্ভব নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১) ধনঞ্জয়কীর (অনুবাদ অধ্যাপক সত্যরঞ্জন রায়), **ডঃ আম্বেদকর - জীবন ও ব্রত**, ডি. অ্যান্ড পি. গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯,১৮।

২) স্বপন কুমার বিশ্বাস, **ভারতীয় সমাজ উন্নয়ন ধারা ঃ ড. আম্বেদকর**, মীরা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২৬৩-২৮৭।

৩) সুশান্ত কুমার সাহিত্য রত্ন, **ভারত রত্ন বাবা সাহেব আম্বেদকর**, সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৯।

৪) **বিধান রায়, ছাত্রদের আম্বেদকর**, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, ২০০৪, পৃ. ৫, ৩৩, ৪৯, ৫০, ৬০।

৫) রামানুজ গাঙ্গুলী, **আম্বেদকর একটি সমাজ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**, পিয়ারসন, দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১০-১৫, ৩৪,৩৬।

৬। নিতাই বসু, **বাবা সাহেব আম্বেদকর**, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৪০, ৪১।

৭। জগদীশ চন্দ্র মন্ডল, **রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও আম্বেদকর**, মহাপ্রাণ পাবলিশিং সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৬২।